ভূমিকা

বাংলাদেশের অর্থনীতি ও জীবিকার সাথে কৃষির সম্পর্ক ঐতিহাসিকভাবে গভীর। এই খাতের অগ্রগতি মূলত একটি সংগঠিত সম্প্রসারণ কাঠামোর মাধ্যমে কৃষকদের কাছে আধুনিক প্রযুক্তি পৌঁছে দেওয়ার ফলে সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশে কৃষি সম্প্রসারণের যাত্রা শুরু হয় ব্রিটিশ শাসনামলে ১৮৭০ সালে রাজস্ব বিভাগের অধীনে কৃষি দপ্তর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে (আরম্ভ স্তর-১)। ১৯০৬ সালে একটি পৃথক পূর্ণাঙ্গ কৃষি দপ্তর গঠিত হয় (আরম্ভ স্তর-২) এবং ১৯১৪ সালে জেলা পর্যায়ে প্রদর্শনী খামার চালুর মাধ্যমে সম্প্রসারণ কার্যক্রম প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। ১৯৫০-১৯৬০ সময়কালে (পরীক্ষা ও গ্রহণ স্তর) ভিলেজ এইড কর্মসূচির মাধ্যমে সম্প্রসারণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত হয়। ১৯৭০-১৯৭৬ সালে (বিভক্তি স্তর) কৃষি দপ্তর শিক্ষা-গবেষণা ও সম্প্রসারণ-ব্যবস্থাপনায় বিভক্ত হয় এবং একক ফসলভিত্তিক বোর্ডগুলোর উদ্ভব ঘটে।

১৯৮১ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট শহীদ জিয়াউর রহমান কৃষি সম্প্রসারণের আধুনিকায়ন এবং এই বিভাগের জন্য বত্রিশ হাজার পদ সম্বলিত সৃষ্ট অর্গানোগ্রাম অনুমোদন করেন এবং এর বাস্তবায়ন দীর্ঘসূত্রতা পরিহার করার জন্য নথিতে সবুজ কালিতে লিখেছিলেন, **"নথিতে রক্ষিত প্রস্তাবসমূহ অনুমোদন করা হলো। সংস্থাপন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতির কোন প্রয়োজন নাই।"** এর ধারাবাহিকতায় একটি বড় পরিবর্তন আসে, ১৯৮২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর (পুনঃএকত্রীকরণ স্তর) ৬টি সংস্থা : ১. কৃষি পরিচালনা দপ্তর (সম্প্রসারণ ও ব্যবস্থাপনা) ২. কৃষি পরিচালনা দপ্তর (পাট উৎপাদন) ৩. শস্য সংরক্ষণ পরিচালনালয় ৪. উদ্যান উন্নয়ন বোর্ড ৫. তামাক উন্নয়ন বোর্ড ৬. কেন্দ্রীয় সম্প্রসারণ সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটকে একত্র করে বাংলাদেশ সরকার ১৯৮২ সালের ১৪/০৯/১৯৮২ খ্রি. তারিখে Extension-1/ka-30/82/433 নং আদেশ বলে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নামকরণ করেন।

বর্তমানে ডিএই কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর, প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি খাদ্য ও **পুষ্টি** নিরাপত্তা, জলবায়ু অভিযোজন, নারীর ক্ষমতায়ন ও টেকসই, নিরাপদ ও লাভজনক কৃষি উন্নয়নে সমন্বিত ভূমিকা রাখছে, যা বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থাকে একটি অনন্য উচ্চতায় উন্নীত করেছে।

২। জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ২০২০ অনুযায়ী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

২.১.১। রূপকল্প (Vision)

নিরাপদ, টেকসই, বহুমুখী ও লাভজনক কৃষি।

২.১.২। অভিলক্ষ্য (Mission)

সকল শ্রেণির কৃষক ও উদ্যোক্তাদের চাহিদাভিত্তিক প্রযুক্তি ও তথ্য সেবা প্রদানের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঘাতসহনশীল, পরিবেশবান্ধব, নিরাপদ, টেকসই ও পুষ্টিসমৃদ্ধ লাভজনক ফসল উৎপাদন।

২.২। মূল উদ্দেশ্য

২.২.১ খাদ্যশস্যসহ বিভিন্ন কৃষি পণ্যের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা এবং কৃষকের আয় বৃদ্ধি;
২.২.২ শস্য বহুমুখীকরণ এবং নিরাপদ ও পুষ্টি সংবেদনশীল কৃষি ব্যবস্থার প্রচলন;
২.২.৩ প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং প্রতিকূল পরিবেশ ও জলবায়ু উপযোগী আধুনিক পরিবেশবান্ধব সম্প্রসারণ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা;
২.২.৪ খামার যান্ত্রিকীকরণ, কৃষি পণ্যের বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে কৃষকদের সহায়তা প্রদান;
২.২.৫ চাহিদাভিত্তিক রপ্তানিমুখী এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ কৃষি শিল্পের প্রসার ও কৃষি বাণিজ্যিকীকরণ এবং কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করা;
২.২.৬ অংশগ্রহণমূলক গবেষণা (Participatory Research) কাজে সহায়তা প্রদান;
২.২.৭ প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং জ্ঞানসমৃদ্ধ দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা।

৩। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কার্যপরিধি

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ৮টি উইং এর মাধ্যমে তাঁর ভিশন,মিশন ও উদ্দেশ্যাবলী অর্জনে বদ্ধপরিকর।

৩.১। উইংগুলোর পরিচিতি

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ৮টি উইংয়ের সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করেন। এই উইংগুলো কৃষি প্রযুক্তি বিস্তার, ফসল উৎপাদন ও গুণগত মান উন্নয়ন, নিরাপদ কৃষিপণ্য উৎপাদন, কৃষি উপকরণ ব্যবস্থাপনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা,

ডিজিটাল সম্প্রসারণ সেবা, কৃষিবাজার সংযোগ ও রপ্তানি উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন, পরিবেশ সুরক্ষা এবং কৃষকের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩.১.১। প্রশাসন ও অর্থ উইং

বাজেট | মানব সম্পদ | সম্পদ ব্যবস্থাপনা | অবকাঠামো | সমন্বয়

- সকল উইংয়ের বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও হিসাবরক্ষণ।
- জনবল ব্যবস্থাপনা (নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি) এবং সরকারি সম্পত্তি (স্থাবর-অস্থাবর) রেকর্ড হালনাগাদকরণ।
- যানবাহন ব্যবস্থাপনা, ভৌত অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ, কর্মপরিবেশ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।
- অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কার্যক্রমের সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান।

৩.১.২। হর্টিকালচার উইং

প্রযুক্তি উদ্ভাবন | বীজ ব্যবস্থাপনা | রাজস্ব অপ্টিমাইজেশন | গবেষণা সহযোগিতা

- উদ্যান ফসলের আধুনিক প্রযুক্তি গবেষণা, সম্প্রসারণ ও মানসম্মত বীজ/চারা উৎপাদন তদারকি।
- দেশী-বিদেশী জার্মপ্লাজম সংগ্রহ, উপযোগিতা যাচাই ও বার্ষিক উৎপাদন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন।
- হর্টিকালচার সেন্টারের রাজস্ব বৃদ্ধি, আয়-ব্যয় ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন।
- গবেষণা প্রতিষ্ঠান/বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধান।
- বেসরকারি নার্সারি/মাশরুম খাতের সঙ্গে সমন্বয় এবং কর্মী দক্ষতা উন্নয়ন।

৩.১.৩। প্রশিক্ষণ উইং

প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা | কৃষক ক্ষমতায়ন | কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট | শিক্ষা বোর্ড পার্টনারশিপ | তথ্য সংরক্ষণাগার

- চাহিদা নিরূপণ, প্রশিক্ষণ সূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন (অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক)।
- উপজেলা/জেলায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমন্বয়, সময়োপযোগী তথ্য সংগ্রহ ও প্রচার।
- প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন, কৃষি ডিপ্লোমা কারিকুলাম ও পাঠ্যসূচি উন্নয়ন।

- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে একাডেমিক ও প্রশাসনিক তদারকি।
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ডাটাবেজ তৈরি, সংরক্ষণ ও মনিটরিং।
- ১৮ টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট এর মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি।

৩.১.৪। ক্রপস উইং

কৌশলগত পরিকল্পনা | প্রযুক্তি বিস্তার | নীতি সহায়তা | উচ্চ মূল্য ফসল | গবেষণা সম্প্রসারণ লিঙ্কেজ

- মাঠ ফসলের আবাদ, উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ।
- কৃষক পর্যায়ে আধুনিক ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি (দানাদার, ডাল, তেলবীজ ইত্যাদি) সম্প্রসারণ।
- প্রযুক্তি গ্রহণের মাত্রা ও ব্যবহারের হার বিশ্লেষণ।
- জাতীয় কৃষি নীতিনির্ধারণে প্রস্তাবনা জমা।
- অর্থকরী ও দানাদার ফসলে বিশেষ কার্যক্রম (যেমন : উচ্চমূল্যের ফসল, হাইব্রিড বীজ)।
- মাঠপর্যায়ের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে সমাধান বাস্তবায়ন।

৩.১.৫। সরেজমিন উইং

কৌশলগত পরিকল্পনা | জলবায়ু অভিযোজন | প্রযুক্তি বিস্তার | অংশীজন সমন্বয়

- মৌসুমি/বার্ষিক কৃষি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন।
- ফসলের আবাদ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং অর্জনের কৌশল প্রণয়ন।
- গবেষণালব্ধ প্রযুক্তি মাঠে সম্প্রসারণ, বীজ/সারের গুণগতমান ও প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ।
- কৃষি যান্ত্রিকীকরণে সমন্বয় ও ই-সম্প্রসারণ সেবা।
- জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলায় কৌশল প্রণয়ন, দুর্যোগ পূর্বাভাস, প্রণোদনা ও পুনর্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়ন।
- প্রতিকূল এলাকায় (উপকূল, চর, হাওড়, পাহাড়, বরেন্দ্র) টেকসই ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি প্রয়োগ।
- কৃষি গবেষণা, শিক্ষা, বাজার ও সম্প্রসারণের মধ্যে সংযোগ স্থাপন।
- সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় সাধন।
- সার ও কীটনাশক ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং।
- রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন, অর্থ ছাড়করণে ভূমিকা।

৩.১.৬। উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং

বালাইনাশক নীতিমালা| গুণগত মান নিশ্চিতকরণ | কৃষক সচেতনতা | গবেষণা-সম্প্রসারণ সংযোগ | ফসল সুরক্ষা

- বালাইনাশকের রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্সিং ও মান নিশ্চিতকরণ (কারখানা পরিদর্শনসহ)।
- নিরাপদ বালাইনাশক উৎপাদন, ল্যাব বিশ্লেষণ ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি মনিটরিং।
- কৃষক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও গবেষণালব্ধ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ।
- জরিপের মাধ্যমে আগাম সতর্কীকরণ ও সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (IPM)।

৩.১.৭। উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং

আন্তর্জাতিক উপযোগীতা | ফাইটোস্যানিটারি সার্টিফিকেশন | আইনি প্রয়োগ | সমন্বয় | মাঠ পর্যবেক্ষণ

- উদ্ভিদজাত পণ্য আমদানি-রপ্তানিতে আন্তর্জাতিক ফাইটোস্যানিটারি বিধি (IPPC) ও Good Agricultural Practice (GAP) অনুসরণ।
- রপ্তানিযোগ্য পণ্যের প্রি-ইনস্পেকশন, ফাইটোস্যানিটারি সার্টিফিকেট ইস্যু ও আমদানিকারক দেশের চাহিদা মোতাবেক যাচাই।
- উদ্ভিদ সংগনিরোধ আইন, আন্তর্জাতিক চুক্তি (কনভেনশন, প্রটোকল) ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ নীতি প্রয়োগ।
- সংগনিরোধ কেন্দ্র, সংশ্লিষ্ট এজেন্সি ও NPPO (জাতীয় উদ্ভিদ সুরক্ষা সংস্থা)-এর সাথে আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়া তত্ত্বাবধান।
- রপ্তানির আগে উদ্ভিদ ও পণ্যের গুণগত মান ও রোগ-পোকা মুক্ততা নিশ্চিতে ফিল্ড ইনস্পেকশন।
- ৩০টি কোয়ারেন্টাইন স্টেশন এর মাধ্যমে বহিরাগত রোগ ও পোকামাকড়ের বিস্তার রোধ

৩.১.৮। পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং

আন্তর্জাতিক লিয়াজোঁ | তথ্য চালিত পরিকল্পনা | প্রজেক্ট লাইফসাইকেল ম্যানেজমেন্ট | ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন | ইনফ্রাস্ট্রাকচার অপ্টিমাইজেশন

- বৈশ্বিক চাহিদা অনুযায়ী কৃষি ডেটা আদান-প্রদান ও রাষ্ট্রদূতদের অবহিতকরণ।

- ফসল ও প্রযুক্তি ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ, ডাটাবেজ তৈরি ও কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- নতুন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই, EIA সার্টিফিকেশন, দাতা সংস্থার সাথে সমন্বয়, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়ন।
- ই-সম্প্রসারণ সেবা, ওয়েবসাইট আপডেট, কৃষক-কর্মকর্তাদের জন্য ডিজিটাল টুলস উন্নয়ন।
- সদর ও মাঠপর্যায়ের ভৌত সুযোগ সুবিধা রক্ষণাবেক্ষণ ও আধুনিকীকরণ।

৪। স্বাধীনতা-উত্তর ১৯৭২ সাল থেকে বর্তমান ২০২৫ সাল পর্যন্ত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অর্জন

৪.১। কৃষি জমি হ্রাস সত্ত্বেও উৎপাদন বৃদ্ধি

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) ১৯৭২-২০২৫ সময়ে নগরায়ণ, শিল্পায়ন ও অবকাঠামো সম্প্রসারণের কারণে কৃষি জমি ১০.৪৮ লাখ হেক্টর কমলেও ফসল উৎপাদনে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। দেশের প্রায় ৪২% জনগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষি খাতে কর্মরত (বিবিএস, ২০২২)।

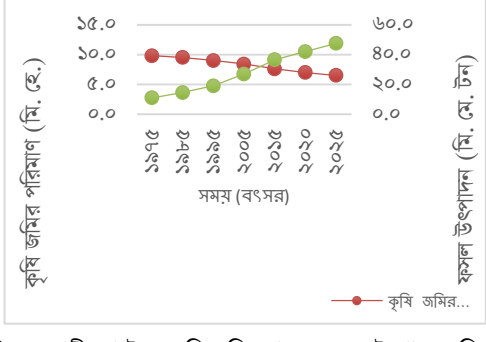

চিত্র-১: স্বাধীনতা উত্তর কৃষি জমির হ্রাস ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি

১৯৮৯ সালে ৮০.২২৬% কৃষি জমি ২০২২ সালে ৭২.৩৫২% এ নেমেছে, কিন্তু ধান উৎপাদন ৩.৫ গুণ (১৯৭২-৭৩ : ১ কোটি টন ⟶ ২০২৩-২৪ : ৩.৮ কোটি টন) বেড়েছে। ২০২৪/২৫-এ ভুট্টা উৎপাদন ৫.৬৪ মিলিয়ন টন (২১% বৃদ্ধি) ও সরিষা ১.৪৩ মিলিয়ন টন (৪৩% বৃদ্ধি) রেকর্ড করা হয়। যথাসময়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার, উচ্চফলনশীল বীজ সহজলভ্যকরণ, গুণগত মানের সার নিশ্চিতকরণ ও কৃষক প্রশিক্ষণ এই সাফল্যের মূল চালিকাশক্তি। (তথ্যসূত্রঃ বিবিএস)

৪.২। জনশক্তিকে সম্পদে রূপান্তর

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) ১৯৭২-২০২৫ সময়ে ৫০ লাখের বেশি কৃষককে আধুনিক চাষাবাদ কৌশল, সার ও বালাই ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ দিয়েছে। উচ্চফলনশীল জাতের ব্যবহারে উৎপাদনশীলতা ৩০% বৃদ্ধি পেয়েছে। নারীর

অংশগ্রহণে কৃষি শ্রমশক্তির ৩৬% নারী (প্রায় ১.৮ কোটি) অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আইসিটি ভিত্তিক সেবার মাধ্যমে ২০ লক্ষাধিক কৃষকের কাছে বীজ, সারের মাত্রা ও বাজারমূল্যের তথ্য সরবরাহ করা হয়। এ সময়ে দশ হাজারেরও অধিক ক্ষুদ্র কৃষিভিত্তিক উদ্যোক্তা গড়ে উঠেছে, যা কৃষি-ব্যবসায় ২৫% প্রবৃদ্ধি এনেছে। জলবায়ু সহনশীল কৌশল (যেমন : লবণাক্ততা-সহিষ্ণু ধান) চালু করে দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় উৎপাদন ১৫% বাড়ানো হয়েছে। এসব উদ্যোগে বাংলাদেশের কৃষিজ জিডিপিতে বার্ষিক ৩.৫% প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে, যা অর্থনীতির ১১.৫% অবদান রাখে (২০২২-২৩)। (তথ্যসূত্রঃ BBS LFS 2022)

৪.৩। জনপুষ্টি উন্নয়নে ডিএই-এর ভূমিকা

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) ১৯৭২-২০২৫ সালে পুষ্টি নিরাপত্তায় নিম্নলিখিত উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেছে

- **বায়োফর্টিফায়েড ফসল:** ২০ লক্ষাধিক কৃষককে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ গোল্ডেন রাইস, জিঙ্ক-সমৃদ্ধ ধান ও উচ্চ আয়োডিনযুক্ত সবজি চাষে প্রশিক্ষণ এবং তথ্য ও কারিগরি সহযোগিতা দেওয়া হয়েছে। এতে ১৫% পরিবারে ভিটামিন-এ ঘাটতি কমেছে (২০২৩)।
- **পুষ্টি বাগান**: ১২ লক্ষাধিক গ্রামীণ বাড়িতে বাড়ির আঙিনায় পুষ্টি বাগান প্রকল্প চালু করে, যা ৩৫ লাখ মানুষের দৈনিক পুষ্টি চাহিদার ৪০% পূরণ করছে। নারীরা ৭০% বাগান ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন।
- **শিক্ষা ও সম্প্রসারণ:** ৫০,০০০ এর অধিক উঠান বৈঠক ও ১,২০০টি পুষ্টি মেলার মাধ্যমে ২ কোটি মানুষকে সচেতন করা হয়েছে। যা পরবর্তীতে সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাধ্যমে স্কুল পুষ্টি হিসেবে ১০,০০০ এর অধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চালু হয়ে ২৫ লাখ শিশুর খাদ্যাভ্যাসে পুষ্টি সংযোজন করেছে।
- **জলবায়ু সহনশীল ফসল:** লবণাক্ততা-সহিষ্ণু ধান (ব্রি ধান ১০৮) ও বন্যা সহনশীল ডাল চাষে ৫ লাখ হেক্টর জমিতে উৎপাদন ১৮% বাড়িয়েছে, যা ২০ লাখ মানুষের পুষ্টি জোগাচ্ছে।
- **সমলয় চাষাবাদ:** বোরো মৌসুমে ২০,৬০০ একর জমি সমলয় চাষের আওতায় আনা হয়েছে (ডিএই, ২০২৩) ।

ফলাফল : ২০১০-২০২৩ সময়ে বাংলাদেশে শিশু স্টান্টিং ৪২% থেকে ২৪.৬%-এ হ্রাস (BDHS ২০২২) ও মাতৃস্বাস্থ্যে রক্তস্বল্পতা ২৬% কমেছে (বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক হেলথ সার্ভে, ২০২৩)। কৃষিজাত পুষ্টি পণ্যের উৎপাদন ৬০% বৃদ্ধি পেয়ে দেশের খাদ্য বৈচিত্র্য সূচক ৭.৫ থেকে ৮.৯ এ উন্নীত হয়েছে।

৪.৪। কৃষি রপ্তানি বৃদ্ধিতে ডিএই-এর সাফল্য

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) কৃষকদের উচ্চফলনশীল ও রপ্তানিযোগ্য ফসল (আম, কাঁঠাল, ড্রাগন ফল, ফুল, শাকসবজি, মশলা, মধু, কফি, কাজু বাদাম, স্ট্রবেরি) চাষে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। নিরাপদ কৃষি (GAP, অর্গানিক সার্টিফিকেশন, ফাইটোস্যানিটারি সার্টিফিকেট) প্রক্রিয়া চালু করে ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানি বাড়ানো হয়েছে।

২০০০ সাল থেকে ফল, ফুল, শাকসবজি রপ্তানি উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পায়। ২০২০ সালে কৃষি রপ্তানি আয় ১,০০০ মিলিয়ন, ২০২৫ সালে লক্ষ্যমাত্রা ১,৫০০ মিলিয়ন।

২০২৩ সালে শুধু আম রপ্তানি ১২,০০০ টন (৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) ছাড়িয়েছে।

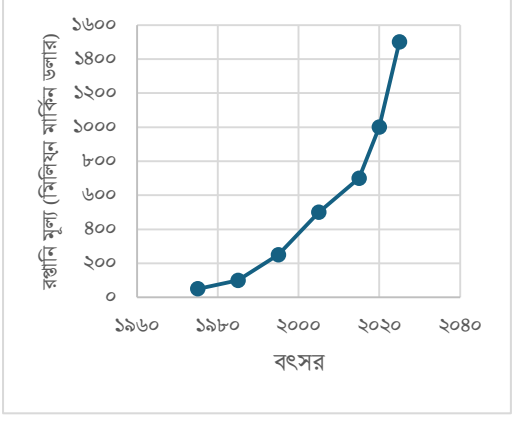

চিত্র-২: বাংলাদেশের কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি (১৯৭৫-২০২৫)

ফলাফল : আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের কৃষিপণ্যের চাহিদা ও প্রতিযোগিতাশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪.৫। কৃষিতে বালাইনাশক ব্যবহার হ্রাস

১৯৭২-২০০০ সালে বালাইনাশকের অপরিকল্পিত ব্যবহার বাড়লেও ২০১০-পরবর্তী সময়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) নিম্নলিখিত পদক্ষেপে এর ব্যবহার কমিয়েছে :

- **সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (IPM)** : ২০১৫-২০২০ সালে IPM পদ্ধতি চালু করে ৫০,০০০ কৃষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ফলে বালাইনাশক ব্যবহার ৩৫% হ্রাস পায়।
- **জৈব বালাইনাশক গ্রহণ** : ২০২০ নাগাদ ২০-২৫% কৃষক জৈব বা প্রাকৃতিক কীটনাশক ব্যবহার শুরু করে।
- **কৃষক প্রশিক্ষণ** : ২০১০ থেকে ১৫,০০০ এর অধিক কৃষককে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিয়ে ৬০% কৃষকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ দক্ষতা বাড়ানো হয়।
- **বার্ষিক ব্যবহার হ্রাস** : ২০১৫-২০২০ সময়ে বালাইনাশক ব্যবহার প্রতি বছর ৩-৫% কমেছে। ২০১৮ সালে ১৫ জেলায় ব্যবহার ৪% হ্রাস পায়।

ফলাফল : মাটির গুণাগুণ ও পরিবেশের উন্নয়নসহ টেকসই কৃষি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৪.৬। খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে শ্রমের মর্যাদা বৃদ্ধি

স্বাধীনতার পর থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৩ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৩৫% কৃষি জমি যান্ত্রিকীকরণের আওতায় এসেছে। যান্ত্রিকীকরণ শুধু উৎপাদন বাড়ায়নি, কৃষকের আয়-মর্যাদা, নারীর অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ ও টেকসই কৃষি ব্যবস্থাপনাকে ত্বরান্বিত করেছে। ২০২৩ সালের তথ্য অনুযায়ী, এ খাতের দ্রুত অগ্রগতি বাংলাদেশের কৃষিকে আধুনিকীকরণের দিকে এগিয়ে নিচ্ছে। নিম্নে এর প্রভাব ও অর্জন সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

প্রধান অর্জন ও প্রভাব

৪.৬.১। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি

- কম্বাইন্ড হারভেস্টার ব্যবহারে ধান কাটার সময় ৬০% হ্রাস।
- ট্র্যাক্টর ও রোটাভেটরের মাধ্যমে জমি চাষের সময় ৫০% কমেছে।
- যান্ত্রিকীকরণের আওতাধীন জমিতে ফসল উৎপাদন ২৫-৩০% বৃদ্ধি।

৪.৬.২। শ্রমের মর্যাদা ও দক্ষতা

- ৩০% কৃষক যন্ত্রপাতি ব্যবহারে প্রশিক্ষিত, যা তাদের মাসিক আয় ৩০-৪০% বাড়িয়েছে ।
- নারীদের অংশগ্রহণ ২৫% বৃদ্ধি, বিশেষত বীজ বপনে ও ফসল সংগ্রহে।

৪.৬.৩। নতুন কর্মসংস্থান

- যন্ত্র মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে ১.৫ লাখ এর অধিক নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি।
- প্রশিক্ষিত যন্ত্র চালকদের পেশাগত মর্যাদা বৃদ্ধি।

৪.৭। কৃষিভিত্তিক শিল্পে কর্মসংস্থান সৃষ্টি

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) ২০১০ সাল থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত ভর্তুকীমূল্যে কৃষকদের আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ, কৃষকদের আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারে দক্ষতা উন্নয়ন, খুচরা যন্ত্রাংশ ব্যবহারে শতভাগ স্থানীয় বাজার নির্ভরশীলতা সৃষ্টি, খামার-থেকে-বাজার (Farm to Fork) ভ্যালু চেইন উন্নয়নে সহায়তা ইত্যাদির মাধ্যমে ট্রাক্টর, কম্বাইন্ড হার্ভেস্টার ও ট্রান্সপ্লান্টার অপারেটর ও মেরামত, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেজিং, লজিস্টিকস, কোয়ালিটি কন্ট্রোল প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রায় দুই লক্ষাধিক কৃষিভিত্তিক শিল্পে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। ডিএই-এর সমন্বিত উদ্যোগ কৃষিকে শিল্পখাতে রূপান্তরিত করছে, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও টেকসই

কর্মসংস্থানের মূল চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে। ২০২৩ সালের তথ্য অনুযায়ী, এ খাতে ৮-১০% বার্ষিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

- **এগ্রো-এক্সপোর্ট হাব** গঠনের মাধ্যমে ২০২৫ সাল নাগাদ রপ্তানিভিত্তিক ৫ লাখ কর্মসংস্থানের লক্ষ্য।
- **ডিজিটাল কৃষি প্ল্যাটফর্ম** (ই-কমার্স, বাজার সংযোগ, ভোক্তা চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন ও সরবরাহ) এর মাধ্যমে যুব ও নারী উদ্যোক্তাদের জন্য নতুন সুযোগ।

৪.৮। শস্য বহুমুখীকরণ

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) শস্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষিকে টেকসই ও লাভজনক খাতে রূপান্তরিত করতে কাজ করছে। ২০২৩ সালের পরিসংখ্যান (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো) সহ মূল অর্জনসমূহ :

৪.৮.১। ধান-কেন্দ্রিক বহুমুখীকরণ

- ধানের পাশাপাশি গম চাষ প্রায় ১১.৭২ লক্ষ মে. টন এবং ভুট্টা চাষ ৬৪.৩১ লক্ষ মে. টন এ পৌঁছেছে (বিবিএস, ২০২৩)।
- সরিষা উৎপাদন ৩৫% বৃদ্ধি পেয়েছে (২০১৫-২০২৩)।

৪.৮.২। সবজি ও ফলমূলের সম্প্রসারণ

- টমেটো, শসা, বেগুনসহ সবজি উৎপাদন ২৫% বৃদ্ধি (২০২০-২০২৩)।
- ১৫০০ এর অধিক জাতের আমের চাষ এবং ২১ টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে (২০২৪)।
- কাঁঠাল, আনারস, লেবু উৎপাদনে দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ; বিভিন্ন ফলমূলের উৎপাদন ১৮% বেড়েছে (২০২৩)।

৪.৮.৩। মসলা ও তেলজাতীয় ফসল

- তিল চাষ ৫০% এবং সয়াবিন উৎপাদন ২০% বৃদ্ধি (২০২৩)।
- চীনাবাদাম উৎপাদনে নতুন রেকর্ড : ২.৫ লাখ মেট্রিক টন (২০২৩)।

৪.৮.৪। ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার

- ২৫-৩০% কৃষক এখন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম (কৃষি পরামর্শ, বাজার তথ্য) ব্যবহার করেন।
- মোবাইল অ্যাপ ও কলসেবার মাধ্যমে ১০ লক্ষাধিক কৃষককে রিয়েল-টাইম সেবা প্রদান।

ডিএই-এর কৌশল

- **প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী :** ৫০০ এর বেশি কৃষি মেলা ও ১,২০০টি প্রদর্শনী প্লটের মাধ্যমে নতুন ফসলের চাষ পদ্ধতি শেখানো।
- **উচ্চমূল্য ফসলের প্রসার :** আম, মরিচ, কফি, কাজুবাদাম, ড্রাগন, স্ট্রবেরি ও জারবেরার মতো নগদ ফসলের চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ।
- **জলবায়ু-সহনশীল জাত :** খরা ও লবণাক্ততা-সহিষ্ণু ফসলের জাত (যেমন: ব্রি ধান ১০০) সম্প্রসারণ।

ডিএই-এর বহুমুখীকরণ উদ্যোগের ফলে কৃষি খাতের উৎপাদনশীলতা, কৃষকের আয় ও খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৩ সালের তথ্য অনুযায়ী, শস্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে ১২% কৃষিজমির ব্যবহার অপ্টিমাইজড হয়েছে, যা জলবায়ু অভিঘাত মোকাবিলায় সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

৪.৯। খোরপোশ কৃষি থেকে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তর

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) খোরপোশ কৃষিকে বাণিজ্যিক খাতে রূপান্তরে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।

৪.৯.১ বাজার-ভিত্তিক উৎপাদন

- সবজি ও ফলমূল উৎপাদন ৩০% বৃদ্ধি (২০২০-২০২৩)।
- ২৫% কৃষক এখন উচ্চমূল্য ফসল (ফল, সবজি, মসলা, ফুল ও মাশরুম) চাষ করেন।

৪.৯.২ যান্ত্রিকীকরণ

- ৫.২ লক্ষ ট্র্যাক্টর ও ১.৮ লক্ষ হারভেস্টার ব্যবহারে উৎপাদনশীলতা ২৫% বৃদ্ধি।
- ৩০০ টি সার্ভিস সেন্টার, ৫৫০০ জন দক্ষ টেকনিশিয়ান।
- উৎপাদন খরচ ২০% হ্রাস (২০২৩ পরিসংখ্যান ব্যুরো)।

৪.৯.৩ প্রক্রিয়াকরণ ও রপ্তানি

- ফল-সবজি প্রক্রিয়াকরণে ৫০০ এর অধিক ইউনিট স্থাপন; রপ্তানি আয় ১৫% বৃদ্ধি (২০২৩)।
- মাশরুম ও ফুল রপ্তানিতে ১০০ কোটি টাকা আয় (২০২২-২৩)।

৪.৯.৪ ঋণ সুবিধা

- ২০% কৃষক বাণিজ্যিক ঋণ নিয়ে আধুনিক কৃষিতে বিনিয়োগ করেছেন (২০২৩)।

ডিএই এর কৌশল

- **প্রশিক্ষণ :** ১০ লক্ষ কৃষককে বাজার বিশ্লেষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও আধুনিক চাষাবাদ প্রশিক্ষণ।
- **ফসল বহুমুখীকরণ :** ধান, ভুট্টা, সয়াবিন, ডাল ফসল, সবজি, সরিষা, কফি, কাজুবাদাম, ড্রাগন, স্ট্রবেরি, সূর্যমুখী ফুলের মতো নগদ অর্থের ফসল সম্প্রসারণ।
- **ডিজিটাল বাজার সংযোগ :** মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ১৫ লক্ষ এর অধিক কৃষকের বাজার তথ্য অ্যাক্সেস।

৪.১০। উচ্চমূল্য ফল ও ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি

- **ড্রাগন ফল :** ২০১০ সালে ৫০ হেক্টর থেকে বেড়ে ২০২৩ সালে ২,০০০ হেক্টর (পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০২৩)।
- **স্ট্রবেরি :** ২০১৫-২০২৩ সময়ে চাষের এলাকা বৃদ্ধি (বর্তমানে ১,২০০ হেক্টর)।
- **মালবেরি, প্যাশন ফল, বেল, অ্যাভোকাডো, রামবুটান, রকমেলন :** ৩০ টির অধিক জেলায় চাষ সম্প্রসারিত; আমলকী উৎপাদন ১৫% বৃদ্ধি (২০২৩)।
- **কুইনোয়া :** ২০১৮ সালে পরীক্ষামূলক চাষ থেকে ২০২৩ সালে ৮০০ হেক্টর এ সম্প্রসারিত।
- **কালো চাল :** ২০১৭-২০২৩ সময়ে উৎপাদন ৪ গুণ বৃদ্ধি (বর্তমানে ৫০০ হেক্টর)।
- **বার্লি ও বাজরা :** স্বাস্থ্য সচেতনতার কারণে চাহিদা বেড়ে উৎপাদন ২০% বৃদ্ধি (২০২৩)।
- **মসলা :** কালজিরা, জিরা, আদা উৎপাদন ২৫% বৃদ্ধি।

ডিএই-এর উদ্যোগে অপ্রচলিত ফল ও ফসলের উৎপাদন কৃষকদের আয়বৃদ্ধি, খাদ্য বৈচিত্র্য এবং রপ্তানি আয়ের নতুন দিগন্ত খুলেছে। ২০২৩ সালের তথ্য অনুযায়ী, এ খাতে ১৫% বার্ষিক প্রবৃদ্ধি লক্ষ করা গেছে, যা টেকসই কৃষির জন্য একটি মাইলফলক।

৪.১১। মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় জৈবসারের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) টেকসই কৃষি নিশ্চিত করতে জৈবসার উৎপাদন ও ব্যবহারে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

৪.১১.১ জৈব সারের উৎপাদন বৃদ্ধি

- ২০১০ সালে ১০ লাখ টন থেকে বেড়ে ২০২৩ সালে ২৫ লাখ টন জৈবসার উৎপাদন (ভার্মি কম্পোস্ট : ৮ লাখ টন)।
- ৮০০টি কমিউনিটি বেজড জৈবসার উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন (২০২৩)।

৪.১১.২ ব্যবহারের সম্প্রসারণ

- জৈবসার ব্যবহার ৩০% কৃষি জমিতে পৌঁছেছে (২০১০ : ৫-৭%)।
- সবজি চাষে ৪৫% কৃষক জৈবসার ব্যবহার করেন (আংশিক/সম্পূর্ণ) (২০২৩)।

৪.১১.৩ পরিবেশগত সুবিধা

- রাসায়নিক সারের ব্যবহার ২০% হ্রাস (২০১৫-২০২৩)।
- মাটিতে জৈব পদার্থের ব্যবহার ১.২% থেকে ২.৫% বৃদ্ধি (২০২৩)।

৪.১১.৪ সার ব্যবস্থাপনায় উদ্যোগ

- **প্রশিক্ষণ কর্মসূচি**: ২০১৫-২০২৩ সময়ে ১৫ লাখ কৃষককে ভার্মিকম্পোস্ট, সবুজ সার ও কম্পোস্ট তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
- **নীতিগত সহায়তা**: ২০০৮ সালের "জৈবসার নীতিমালা" অনুযায়ী উৎপাদন কেন্দ্রে ভর্তুকি ও প্রণোদনা প্রদান।
- **ডেমো প্লট**: ৫,০০০ এর অধিক প্রদর্শনী প্লটের মাধ্যমে জৈবসারের কার্যকারিতা দেখানো।

ডিএই-এর উদ্যোগে জৈবসার ব্যবহারের হার বাড়লেও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কৃষকদের মধ্যে সচেতনতা আরও বাড়ানো প্রয়োজন। ২০২৩ সালের তথ্য অনুযায়ী, জৈবসার খাতে ১২% বার্ষিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করে বাংলাদেশ টেকসই কৃষির দিকে এগিয়ে চলেছে।

৪.১২। নিরাপদ ফসল উৎপাদনে GAP বাস্তবায়ন

২০১৫ সালে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) বাংলাদেশ GAP ফ্রেমওয়ার্ক চালু করে, যা মাটি, পানি, সার ব্যবস্থাপনা, শ্রমিক স্বাস্থ্য ও ফসল সংরক্ষণে মানদণ্ড নির্ধারণ করে। ২০১৭ সালে গাইডলাইন প্রকাশিত হয় এবং ২০১৮ থেকে মাঠপর্যায়ে প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

২০২৫ সাল নাগাদ ১০০টি নিরাপদ ফসল উৎপাদন এলাকা গঠন। ২০২৫ সালে GAP-অনুগত ফসল মোট কৃষি উৎপাদনের ৮-১০% (২০১৮ : ৫০,০০০ মে.টন → ২০২৫ : ৪ লাখ মে.টন, ৮ গুণ বৃদ্ধি)। টমেটো, শসা, পেয়ারা, লিচু, আম ও ধানে GAP ব্যবহার বাড়ছে। ডিএই-এর এই উদ্যোগ টেকসই কৃষি ও আন্তর্জাতিক বাজারসংযোগ ত্বরান্বিত করছে।

৪.১৩। বাংলাদেশের শীর্ষ কৃষিপণ্যের বিশ্ব র‍্যাংকিং (FAO, ২০২১)

ফসল/পণ্য	বিশ্বে অবস্থান	মূল তথ্য
পাট	২য়	ভারতের পরে দ্বিতীয় বৃহৎ উৎপাদক
মরিচ (শুকনো)	২য়	চীন ও থাইল্যান্ডকে অতিক্রম করেছে
ধান (চাল)	৩য়	২০২০ সালে ইন্দোনেশিয়াকে পেছনে ফেলে
সবজি	৩য়	বিশ্বের ৫০ টি দেশে রপ্তানি হয়
আলু	৭ম	৯.৮ মিলিয়ন টন উৎপাদন (২০২১)
আম	৯ম	উল্লেখযোগ্য উৎপাদন ও রপ্তানি সম্ভাবনা

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য অবস্থান

- সুপারি (২য়), রসুন (৩য়), চা (৮ম), পেয়ারা (৯ম), নারকেল (৭ম)।

সাফল্যের কারণ

- উচ্চ ফলনশীল জাত, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, সরকারি সহায়তা, সেচ ও সার ব্যবস্থার উন্নয়ন।

৫। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

৫.১। প্রধান চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় (Major Challenges & Way Forward)

৫.১.১। কৃষি জমি হ্রাস, ভূমিসত্ত্ব ব্যবস্থা ও কৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা:

বাংলাদেশে কৃষি পরিবার সংখ্যা কৃষি শুমারি অনুযায়ী ১৯৯৬ সালে ২.৬ কোটি থেকে ২০১৯ সালে ৩.৬ কোটিতে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা গত ২৩ বছরে প্রায় ৩৮% বৃদ্ধি নির্দেশ করে। এর ফলে খাদ্য চাহিদাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু একই সময়ে দেশের কৃষিজমি বছরে গড়ে প্রায় ০.১৯% হারে কমছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৮ সালে নেট চাষযোগ্য জমি ছিল ১.৯০ কোটি একর, যা ২০১৯ সালে ২%

(৪.১৬ লক্ষ একর) হ্রাস পেয়ে ১.৮৬ কোটি একরে নেমে আসে (চিত্র-১)। ফলস্বরূপ, ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

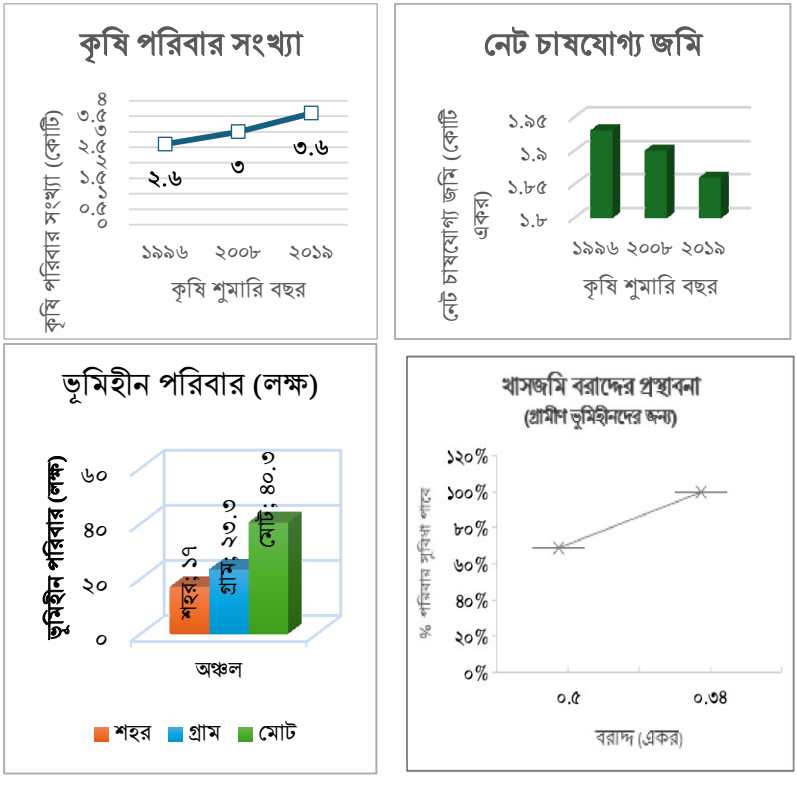

চিত্র-১: কৃষি পরিবার সংখ্যা, চাষযোগ্য জমি, এবং ভূমিহীনতার হার

কৃষি শুমারি ২০১৯ অনুযায়ী, সম্পূর্ণ জমিহীন পরিবার শহরাঞ্চলে ২৮.৭৯% (প্রায় ১৭ লাখ) এবং গ্রামে ৭.৮৬% (প্রায় ২৩.৩ লাখ), যা মোট পরিবারের ১১.৩৩% (প্রায় ৪০.৩ লাখ)। এই ভূমিহীন ও অতি দরিদ্র পরিবারগুলোকে খাসজমি বরাদ্দের মাধ্যমে পতিত জমি আবাদযোগ্য করা গেলে টেকসই কৃষি উৎপাদন নিশ্চিত করা সম্ভব।

দেশে মোট খাসজমির পরিমাণ প্রায় ৩.৩ মিলিয়ন একর (প্রায় ১.৩৩৫ মিলিয়ন হেক্টর), যার মধ্যে প্রায় ০.৮ মিলিয়ন একর কৃষি খাস, ১.৭ মিলিয়ন একর অকৃষি খাস এবং ০.৮ মিলিয়ন একর খাস জলাশয়। নীতিগতভাবে, খাসজমি ৯৯ বছরের লিজে সাধারণত ভূমিহীন বা অতি দরিদ্র পরিবারকে ১-৩ একর করে বরাদ্দ দেওয়া যায়।

হিসেব অনুযায়ী, যদি কৃষি-খাস জমি কেবল গ্রামীণ ভূমিহীনদের মধ্যে ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেককে ০.৫ একর করে দেওয়া হয়, তাহলে প্রায় ৬৯% পরিবার সুবিধা পাবে। আবার, ০.৩৪ একর করে বরাদ্দ দিলে ১০০% গ্রামীণ ভূমিহীন পরিবার খাদ্যশস্য, সবজি, ডাল এবং ফল আবাদ করে পরিবারের খাদ্য ব্যয় ও বাজার নির্ভরতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে সক্ষম হবে। এভাবে খাদ্য নিরাপত্তা ও সামাজিক ন্যায়বিচার একসাথে নিশ্চিত করা সম্ভব।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কে কৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত করা গেলে দেশের উৎপাদন ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হবে।

৫.১.২। ভূমির উপরিস্তর অপসারণ ও কৃষি জমির অবনতি

বাংলাদেশে কৃষিজমির উপরিস্তর (topsoil) অপসারণ একটি গুরুতর পরিবেশগত ও কৃষি-সম্পর্কিত সংকটে পরিণত হয়েছে। গবেষণা অনুযায়ী, প্রতিবছর প্রায় ৩,৩৫০ মিলিয়ন ঘনফুট (≈৬০ মিলিয়ন টন) উর্বর কৃষিজমির উপরিস্তর অপসারণ করে প্রায় ৭,০০০ ইটভাটায় ব্যবহার করা হচ্ছে, যা দেশের কৃষি উৎপাদন ও পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি (মৃত্তিকা গবেষণা উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ২০২৩; পরিবেশ অধিদপ্তর, ২০২২)। এ অপসারণের ফলে মাটির ৮৫-৯০% জৈব পদার্থ এবং ৬০-৭০% নাইট্রোজেন, ফসফরাস, সালফার, পটাশিয়াম ও মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস নষ্ট হয়ে যায়। এর প্রত্যক্ষ প্রভাবে কৃষিজমিতে ১৫-২৫% উৎপাদন হ্রাস, ৫-৭% জমি স্থায়ীভাবে চাষের অযোগ্য, এবং জমির আকৃতিতে ৮-১২ ফুট গভীর গর্ত তৈরি হয় যা নদীতীর দুর্বল করে, বন্যার ঝুঁকি বাড়ায় এবং কৃষকের উপর অতিরিক্ত রাসায়নিক সারের নির্ভরতা আরোপ করে।

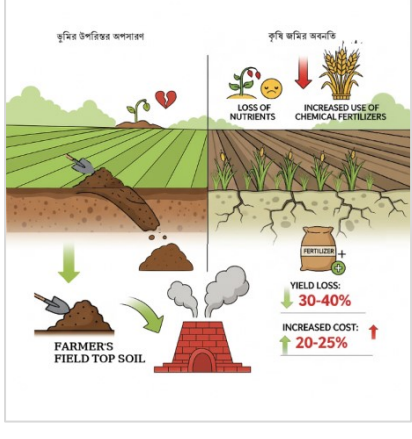

পুষ্টি ঘাটতি পূরণে কৃষকদের প্রতি হেক্টরে অতিরিক্ত ১২,০০০-১৫,০০০ টাকা সমমূল্যের সার প্রয়োগ করতে হয়। জাতীয়ভাবে বছরে প্রায় ১,৫০,০০০ হেক্টর জমিতে অতিরিক্ত ৩০-৩৭.৫ হাজার টন ইউরিয়া, ১২-১৫ হাজার টন টিএসপি

এবং ১৮-২২.৫ হাজার টন এমওপি ব্যবহার করতে হয়, যার জন্য দেশের অর্থনীতিকে ১,৮০০-২,২৫০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বহন করতে হচ্ছে। এতে কৃষকদের উৎপাদন খরচ ৩০-৪০% বেড়ে যাচ্ছে, আর্থিক লাভজনকতা কমছে এবং কৃষি খাত টেকসইতা হারাচ্ছে। পাশাপাশি মাটির কার্বন সংরক্ষণ ক্ষমতা কমে গিয়ে পরিবেশে অতিরিক্ত কার্বন নিঃসরণ ঘটছে, যা জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে।

এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় Brick making and Brick Field (Control) Act 2019 এর কঠোর বাস্তবায়ন, পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার, এবং কৃষকদের টপসয়েল সংরক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)'র পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০,০০০ কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান, সবুজ সার ও কম্পোস্ট ব্যবহারের প্রসার এবং সচেতনতা কর্মসূচি পরিচালনা মাটির উর্বরতা পুনরুদ্ধারে সহায়ক হবে। ডিএই' র লক্ষ্যভিত্তিক পুনরুদ্ধার কর্মসূচি হলো ২০৩০ সালের মধ্যে টপসয়েল অপসারণ ৫০% হ্রাস এবং অবক্ষয়িত (degraded) জমির ২০% পুনরুদ্ধার, যা কৃষি উৎপাদনশীলতা টেকসই করবে এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

৫.১.৩। কঠিন বর্জ্য (Solid Waste) অব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ দূষণ এবং ফসলের উৎপাদনশীলতা হ্রাস।

চ্যালেঞ্জ : বাংলাদেশে প্রতিদিন ২৩,৭০০ টন কঠিন বর্জ্য উৎপন্ন হয় (বাৎসরিক ২২.৪ মিলিয়ন টন), যার ৬০-৮০% জৈব। শহরে বর্জ্যের মাত্র ৫৫-৬০% সংগ্রহ হয়, উৎসে পৃথকীকরণ ব্যাতীরেকে কম্পোস্টিং সক্ষমতা ৪০%-এর নিচে, (সূত্র: বিশ্বব্যাংক, ২০২৩; ওয়েস্ট কনসার্ন, ২০২২; বিএআরসি জরিপ, ২০২৩) ।

উপায়: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতায় প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে বর্জ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, কম্পোস্টিং অবকাঠামো সম্প্রসারণ, কম্পোস্ট মান নিয়ন্ত্রণ N:P:K অনুপাত নিশ্চিত করতে মান নিয়ন্ত্রণ প্রোটোকল চালু, কৃষক প্রশিক্ষণ/সচেতনতা বৃদ্ধি ও সাশ্রয়ী পরিবহন নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সার আমদানিতে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় এবং মাটর স্বাস্থ্য সুরক্ষার মাদ্যমে ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে ।

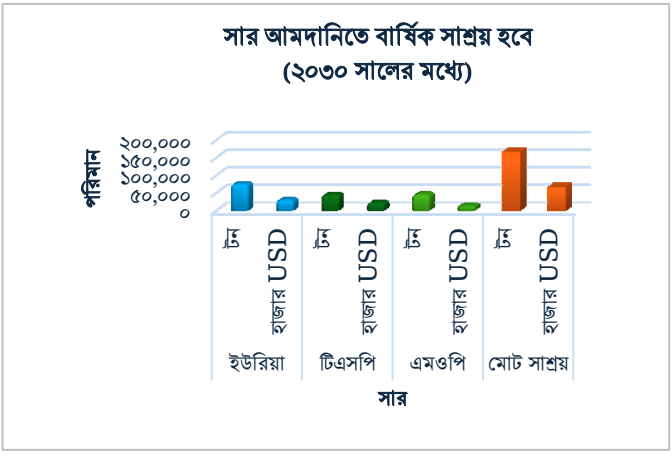

লক্ষ্যমাত্রা : ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০% জৈব বর্জ্য (৯,৪৮০ টন/দিন) কম্পোস্টে রূপান্তর। এতে সার আমদানিতে বার্ষিক সাশ্রয়: **ইউরিয়া**: ৭৫,২১৭ টন (মূল্য ৩০.০৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), **টিএসপি**: ৪৫,১৩০ টন (মূল্য ২২.৫৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, **এমওপি:** ৪৬,১৩৩ টন (মূল্য ১৩.৮৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), **মোট সাশ্রয়**: ৬৬.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (৳৭,০০০ কোটি) (সূত্র: এফএও, ২০২৩; বিশ্বব্যাংক মূল্য সূচক)।

৫.১.৪ গোবর অব্যবস্থাপনা, পরিবেশ দূষণ ও সারের সম্ভাব্য ক্ষতি

চ্যালেঞ্জ: বাংলাদেশে প্রতিদিন ০.৩০-০.৪৪ মিলিয়ন টন গবাদিপশুর গোবর উৎপন্ন হয় (বাৎসরিক ১১০-১৬০ মিলিয়ন টন)। এর ৯৫%-এর বেশি অব্যবস্থাপনার শিকার যা মিথেন নিঃসরণ করছে (কৃষি খাতের গ্রিনহাউজ গ্যাসের ১২%), ভূগর্ভস্থ পানি দূষণ এবং সারের সম্ভাব্যতা নষ্ট করছে (সূত্র: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ২০২৩; আইপিসিসি, ২০১৯)।

উপায়: ডিএই প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে বৃহৎ আকারের কম্পোস্টিং/বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন, কম্পোস্ট/বায়োস্লারির জন্য N:P:K অনুপাত মান নিশ্চিতকরণ, কৃষকদের জৈব সার ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ প্রদান ও বায়োগ্যাস ইউনিট ও কম্পোস্ট উৎপাদনে ভর্তুকি প্রদান নিশ্চিত করবে।

লক্ষ্যমাত্রা: ২০৩০ সালের মধ্যে মোট উৎপাদিত গোবরের ৫০% গোবর (০.১৮৫ মিলিয়ন টন/দিন) রূপান্তর করে কম্পোস্ট/বায়োস্লারি: ০.১৫-০.১৭ মিলিয়ন টন/দিন, বায়োগ্যাস: ৩.৫-৪.৫ মিলিয়ন ঘন মিঃ/দিন উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করবে। যা সার আমদানিতে সাশ্রয় করবেঃ ইউরিয়া: ৬,৯০,০০০ টন/বছর (২৭৬ মিলিয়ন ডলার, টিএসপি: ৩,৪৫,০০০ টন/বছর (১৭২.৫ মিলিয়ন ডলার), এমওপি: ৫,২৯,০০০ টন/বছর (১৫৮.৭ মিলিয়ন ডলার), মোট ৬০৭.২ মিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় ঘটাবে। গ্রিনহাউজ গ্যাস হ্রাস: ৫৪.৬ মিলিয়ন টন CO_2-সমান/বছর (সূত্র: এফএও; আইপিসিসি; বায়োগ্যাস কনসোর্টিয়াম স্টাডিজ)

৫.১.৫ উপকূলীয় অনাবাদি/ পতিত জমিতে নারিকেল উৎপাদন ও বেষ্টনী

চ্যালেঞ্জ: বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকূলীয় জেলাগুলোতে (খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা) লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা এবং ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছাসের কারণে প্রতিবছর প্রায় ৪.০–৪.৫ লাখ হেক্টর জমি আবাদ বহির্ভূত বা পতিত অবস্থায় থাকে (সূত্র: মাটির উর্বরতা জরিপ, বিএআরসি ২০২৩; উপকূল উন্নয়ন বোর্ড ২০২২)। এই পতিত জমি কৃষি উৎপাদনে অংশগ্রহণ না করায় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা এবং কৃষকের আয় কমে যাচ্ছে।

একইসাথে, উপকূলীয় বসতবাড়ি ও কৃষিজমি ঝড় ও জলোচ্ছাসে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্তমানে উপকূলীয় অঞ্চলে বসতবাড়ির ৩৫-৪০% কাঠামো ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং প্রাকৃতিক বেষ্টনী দুর্বল হওয়ায় প্রাণহানি ও কৃষি ক্ষতির ঝুঁকি বাড়ছে (সূত্র: পরিবেশ অধিদপ্তর, ২০২৩; সিডিএমপি রিপোর্ট, ২০২২)।

উপায়: উপকূলীয় পতিত ও অনাবাদি জমিকে কাজে লাগিয়ে নারিকেল চাষ সম্প্রসারণ করলে একদিকে পতিত জমি আবাদযোগ্য হবে, অন্যদিকে প্রাকৃতিক বেষ্টনী তৈরি করে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের প্রভাব কমানো সম্ভব হবে। নারিকেল গাছ লবণাক্ততা ও বাতাস সহনশীল হওয়ায় এটি দীর্ঘমেয়াদে কৃষকদের জন্য টেকসই আয় ও পুষ্টি সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এ লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ২০২৫-২০৩৫ মেয়াদে উপকূলীয় ১৫ জেলায় প্রায় ২.৫ লাখ হেক্টর পতিত জমিতে নারিকেল চাষ সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বসতবাড়ি, রাস্তার ধারে, খাল ও বাঁধের ধারে "নারিকেল বেষ্টনী বেল্ট" গড়ে তোলা হলে প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি সবুজ অবকাঠামো শক্তিশালী হবে।

পাশাপাশি কৃষক সমবায় ভিত্তিক নারিকেল বাগান স্থাপন এবং আধা-প্রক্রিয়াজাত নারিকেলজাত পণ্য যেমন: কোরানো নারিকেল, নারিকেল দুধ ও নারিকেল তেল উৎপাদনে স্থানীয় উদ্যোক্তা তৈরি করা যাবে। গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেমন: বিএআরআই ও বিএআরসি উদ্ভাবিত লবণাক্ততা সহনশীল নারিকেল জাত ব্যবহার এবং কৃষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে এ উদ্যোগকে আরও টেকসই ও কার্যকর করা সম্ভব হবে।

লক্ষ্যমাত্রা : ২০৩৫ সালের মধ্যে উপকূলীয় অঞ্চলে ২.৫ লাখ হেক্টর অনাবাদি জমিতে নারিকেল বাগান স্থাপনের মাধ্যমে বছরে প্রায় ২০০–২৫০ কোটি নারিকেল ফল উৎপাদন করে ৮,০০০ থেকে ১০,০০০ কোটি টাকার সমমূল্যের ফসল পাওয়া যাবে। এতে প্রায় ২০ লাখ কৃষক পরিবার সরাসরি উপকৃত হবে এবং ১,২০০ কিমি উপকূলজুড়ে নারিকেল বেষ্টনী গড়ে ঘূর্ণিঝড় ক্ষতি ২০–২৫% পর্যন্ত কমানো সম্ভব হবে। একই সঙ্গে আমদানি নির্ভর ভোজ্যতেল বাজারে ২০–৩০% সাশ্রয় হবে এবং নারিকেলজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে প্রতিবছর অতিরিক্ত ৩০০ হতে ৪০০ মিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যাবে।

উপকূলীয় পতিত জমি আবাদযোগ্য করে নারিকেল উৎপাদন ও বেষ্টনী স্থাপন করলে খাদ্য নিরাপত্তা, কৃষকের আয় বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা এবং রপ্তানি আয় সবগুলো লক্ষ্য একসাথে অর্জন সম্ভব হবে।

৫.১.৬ কফি উৎপাদন ও রপ্তানি

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট : কফি বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় পানীয়, যার বৈশ্বিক উৎপাদন প্রায় ১ কোটি টন এবং বাজারমূল্য প্রায় ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

দেশীয় অবস্থা : বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ১৮০০ হেক্টর জমিতে কফি আবাদ হচ্ছে, যেখানে উৎপাদন মাত্র ৭০–৮০ টন। অথচ দেশে প্রতিবছর প্রায় ২২০০ টন কফি আমদানি করতে হয়, যার বাজারমূল্য ৮০০–৯০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রায় ৯০ শতাংশই ইনস্ট্যান্ট কফি।

সম্ভাবনা : দেশের প্রায় সব অঞ্চলে কফি আবাদ সম্ভব হলেও পার্বত্য অঞ্চল ও চা-বাগান এলাকায় এর সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। পরিকল্পিতভাবে ৪০,০০০ হেক্টর জমিতে কফি আবাদ সম্প্রসারণ করা হলে প্রায় ১.০ লক্ষ টন কফি উৎপাদন করা যাবে।

লক্ষ্যমাত্রা : দেশীয় চাহিদা পূরণের পাশাপাশি রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা।

প্রয়োজনীয় উদ্যোগ : আধুনিক জাত ও প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ অবকাঠামো গড়ে তোলা, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি, বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন। এ লক্ষ্যে প্রায় ১৫০ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রয়োজন।

৫.১.৭ কাজু বাদাম উৎপাদন ও রপ্তানি

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট : বাদাম জাতীয় ফসলের মধ্যে কাজুবাদামের অবস্থান শীর্ষে। বৈশ্বিক উৎপাদন প্রায় ৩.৯ মিলিয়ন টন এবং বাজারের আকার ৯.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

দেশীয় অবস্থা : বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৪৫০০ হেক্টর জমিতে কাজুবাদাম চাষ হচ্ছে, যেখানে উৎপাদন প্রায় ২৭০০ টন। অন্যদিকে, প্রতিবছর ২০০০–২২০০ টন প্রক্রিয়াজাত কাজুবাদাম আমদানি করতে হয়, যার বাজারমূল্য ৬০০–৭০০ কোটি টাকা। দেশীয় উৎপাদন দিয়ে এ আমদানির মাত্র ১০% পূরণ সম্ভব হচ্ছে।

সম্ভাবনা : প্রতিবছর প্রায় ১৫,০০০–২০,০০০ টন কাঁচা কাজুবাদামের প্রয়োজন হলেও পার্বত্য অঞ্চলের অনাবাদি ২.০ লক্ষ হেক্টর জমির মধ্যে মাত্র ৩০,০০০ হেক্টর জমি ব্যবহার করেই প্রায় ১.০ লক্ষ টন কাজুবাদাম উৎপাদন সম্ভব।

লক্ষ্যমাত্রা : দেশীয় চাহিদা পূরণের পাশাপাশি রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় বৃদ্ধি।

প্রয়োজনীয় উদ্যোগ : উন্নত জাত ও প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি, উদ্যোক্তাদের সহায়তা এবং বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রায় ৩৫০ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রয়োজন।

৫.১.৮ মাশরুম উৎপাদন ও রপ্তানি

দেশীয় চাহিদা : বাংলাদেশে ১৭ কোটি মানুষের জন্য বছরে প্রায় ১৫.৫১ লক্ষ মে.টন মাশরুমের প্রয়োজন। যদি মাত্র ১০% মানুষ নিয়মিত মাশরুম খান, তখন দৈনিক প্রয়োজন প্রায় ৪৫০ মে.টন। মাশরুমের নিয়মিত ব্যবহার স্বাস্থ্যসুরক্ষা যেমন- টিউমার প্রতিরোধ, উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে সেক্ষেত্রে চাহিদা আরও বৃদ্ধি পায়।

বর্তমান উৎপাদন: দেশে বর্তমানে বছরে ৪০–৪২ হাজার মে.টন মাশরুম উৎপাদন হয়, যার মধ্যে ওয়েস্টার মাশরুম প্রধান এবং ব্ল্যাক/কান, মিল্কি, ঋষি ও বাটন জাতের উৎপাদনও কিছু অংশে রয়েছে। মোট বাজারমূল্য প্রায় ৮০০ কোটি টাকা বা ৬৫.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

সম্ভাবনা ও সম্প্রসারণ : দেশে মাশরুম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে স্থানীয় চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। ২০৩০–২০৩৩ সালের মধ্যে মাশরুম উৎপাদন সম্প্রসারণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের উন্নয়নের মাধ্যমে বার্ষিক বাজার মূল্য ১১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করার সম্ভাবনা রয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা : দেশীয় চাহিদা পূরণ, প্রক্রিয়াজাত মাশরুম উৎপাদন সম্প্রসারণ, এবং রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন।

প্রয়োজনীয় উদ্যোগ : উন্নত প্রজাতি ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, উচ্চ দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি, আধুনিক প্রক্রিয়াজাতকরণ সুবিধা গড়ে তোলা এবং বাজারজাতকরণের ব্যবস্থাপনা। পাশাপাশি স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্থানীয় চাহিদা বৃদ্ধি ও রপ্তানির সম্ভাবনা উন্নয়ন করা।

৫.১.৯ জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন

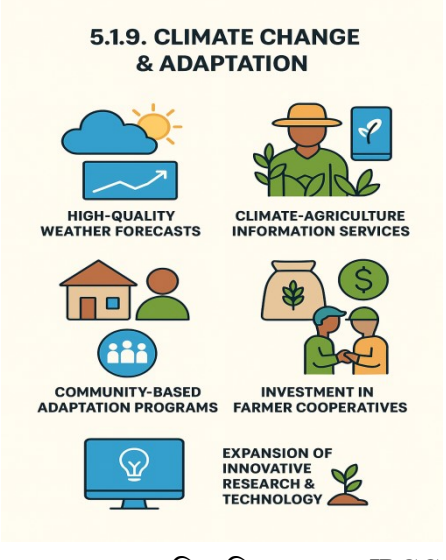

বাংলাদেশ একটি জলবায়ু-সহনশীলতার চরম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ, যেখানে নদীজলবাহী বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সমুদ্রপৃষ্ঠ বৃদ্ধি এবং লবণাক্ততার বিস্তার কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য প্রধান হুমকি হিসেবে কাজ করছে। গত ৫০ বছরে দেশে গড় তাপমাত্রা প্রায় ১.২± সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ফসলের ফসলদক্ষতা, জমির উর্বরতা এবং কৃষকের আয়কে প্রভাবিত করছে। বিশেষ করে বর্ষাকালে বন্যা, খরাপ্রবণ অঞ্চলে দীর্ঘ সময়ের খরা এবং উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে কৃষি উৎপাদনহানি বৃদ্ধি পেয়েছে। (সূত্র: বিএমডি, ২০২৩; IPCC, 2022)।

উপায়: জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কমাতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন অভিযোজন কৌশল গ্রহণ করছে। এর মধ্যে রয়েছে- উচ্চ লবণসহনশীল ধান ও সবজি জাতের সম্প্রসারণ, পানি সংরক্ষণ ও বৃষ্টির পানি সঞ্চয় প্রযুক্তি, ক্ষুদ্র নালা এবং বাঁধ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, আধা-যান্ত্রিক চাষাবাদ ও শস্য আবর্তন এবং কৃষক প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম।

লক্ষ্যমাত্রা: ২০৩০ সালের মধ্যে উপকূলীয় ও বন্যাপ্রবণ অঞ্চলের ৭০% কৃষককে জলবায়ু অভিযোজন প্রযুক্তি গ্রহণে সক্ষম করা, কৃষিজমির উর্বরতা ও উৎপাদনশীলতা ২০–২৫% বৃদ্ধি, এবং ফসল ক্ষতির ঝুঁকি কমিয়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এছাড়া, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে ঝুঁকি হ্রাস ও টেকসই কৃষি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জলবায়ু-সহনশীলতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা হবে।

প্রয়োজনীয় উদ্যোগ: উচ্চ মানের আবহাওয়া পূর্বাভাস, কৃষি-জলবায়ু তথ্য সেবা, স্থানীয় সম্প্রদায়ভিত্তিক জলবায়ু অভিযোজন কর্মসূচি, কৃষক সমবায় ও উদ্যোগে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, এবং উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ও গবেষণার সম্প্রসারণ। এই উদ্যোগগুলো দ্বারা ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকরা ঝুঁকি মোকাবিলা করতে পারবে এবং দেশের কৃষিক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।

৫.১.১০ যান্ত্রিকীকরণ ও কাস্টম হায়ারিং সেন্টার

বাংলাদেশের কৃষি অর্থনীতিতে কৃষকের আধুনিকীকরণ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য যান্ত্রিকীকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের ১৬.৫ মিলিয়ন কৃষক পরিবার এবং ১৪.৩ মিলিয়ন হেক্টর চাষযোগ্য জমি সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকর সম্প্রসারণ সেবা, ইনপুট বিতরণ এবং ঋণ সহায়তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজন প্রযুক্তি ভিত্তিক সমাধান।

প্রযুক্তি নির্ভর অ্যাপভিত্তিক কাস্টম হায়ারিং সেন্টার স্থাপন করে কৃষি যন্ত্রপাতি সহজলভ্য করা সম্ভব। এই সেন্টারগুলোতে উদ্ভাবনী কৃষক ও প্রযুক্তি গ্রহণকারী গোষ্ঠীগুলো যন্ত্রপাতি ভাড়া নিতে পারবে। এতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, শ্রম খরচ হ্রাস এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ নিশ্চিত হবে। সরকারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (যেমন IDA, IFAD, FAO) থেকে প্রাপ্ত সহায়তা দিয়ে এই সেন্টারগুলো স্থাপন ও পরিচালনা করা যেতে পারে।

লক্ষ্যমাত্রা: ২০৩০ সালের মধ্যে প্রতিটি উপজেলা ও ইউনিয়নে কমপক্ষে একটি করে কাস্টম হায়ারিং সেন্টার স্থাপন করা, কৃষি যন্ত্রপাতি ভাড়া প্রদান নিশ্চিত করা, এবং কৃষকদের জন্য প্রযুক্তি গ্রহণ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা ২০–২৫% বৃদ্ধি করা।

৫.১.১১ কৃষক স্মার্ট কার্ড

'কৃষক স্মার্ট কার্ড' (KSC) ও কৃষক স্মার্ট অ্যাপ বাংলাদেশের কৃষি খাতে ডিজিটাল রূপান্তরের অন্যতম হাতিয়ার। প্রতিটি কৃষকের জন্য ইউনিক স্মার্ট কার্ড ও ডিজিটাল প্রোফাইল তৈরি হলে কৃষকের জমির পরিমাণ, ফসলভিত্তিক তথ্য, ভর্তুকি গ্রহণ, আর্থিক সেবা, বাজার তথ্য ও প্রশিক্ষণ এক প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত করা সম্ভব হবে। এর

ফলে ভর্তুকি বিতরণে স্বচ্ছতা আসবে, কৃষকের আয় বাড়বে এবং উৎপাদন খরচ কমবে।

উপায়ঃ এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে কৃষকের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই, কার্ড বিতরণ, ডিজিটাল অ্যাপ চালু, এবং মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস (MFS) ও ব্যাংকিং চ্যানেলের সাথে সমন্বয় করা হবে। অ্যাপের মাধ্যমে কৃষকরা আবহাওয়া তথ্য, বাজারদর, যান্ত্রিক সরঞ্জাম ভাড়া এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য সহজেই পাবে। পাশাপাশি ডেটা সুরক্ষায় আন্তর্জাতিক মানদন্ড (PCI-DSS, ISO-27001) অনুসরণ করা হবে।

লক্ষ্যমাত্রাঃ ২০২৮ সালের মধ্যে কমপক্ষে দুই কোটি কৃষককে স্মার্ট কার্ড ও অ্যাপের আওতায় আনা হবে। এর মাধ্যমে কৃষকের উৎপাদন খরচ ১৫–২০% হ্রাস, যান্ত্রিকীকরণের হার ৫০% থেকে ৭০% এ উন্নীত করা, এবং যুব কৃষক ও উদ্যোক্তাদের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সম্পৃক্ত করে বিনিয়োগ বাড়ানো হবে। একই সঙ্গে কৃষি ভর্তুকি বিতরণে শতভাগ স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে।

প্রয়োজনীয় উদ্যোগ: কৃষক স্মার্ট কার্ড ও অ্যাপের মাধ্যমে ডিজিটাল তথ্যভিত্তিক সেবা সম্প্রসারণ, প্রাইভেট ক্লাউডে নিরাপদ তথ্য সংরক্ষণ, PCI-DSS ও ISO-২৭০০১ কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা, EMV চিপ কার্ড ব্যবহার, MFS ও ব্যাংকের সাথে ইন্টিগ্রেশন, এবং সেন্টার ভিত্তিক যান্ত্রিক সরঞ্জামের সহজলভ্যতা। পাশাপাশি, জেলা ও উপজেলা কমিটির মাধ্যমে রিয়েল-টাইম পর্যবেক্ষণ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

৫.১.১২ কৃষিতে 4IR এর ব্যবহার ও প্রিসিশন ফারমিং

চ্যালেঞ্জ: বাংলাদেশে 4IR প্রযুক্তি কৃষিক্ষেত্রে সম্প্রসারণে প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো উচ্চ প্রারম্ভিক খরচ, প্রযুক্তিগত দক্ষতার অভাব, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার ঘাটতি, ছোট ও মধ্যম আকারের কৃষকগোষ্ঠীর জন্য সীমিত অ্যাক্সেস এবং ডিজিটাল অবকাঠামোর অপর্যাপ্ততা। এছাড়া, ডেটা সুরক্ষা, ইন্টারনেট সংযোগের অস্থিতিশীলতা এবং সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার মধ্যে সমন্বয়হীনতা ও প্রযুক্তি গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করে।

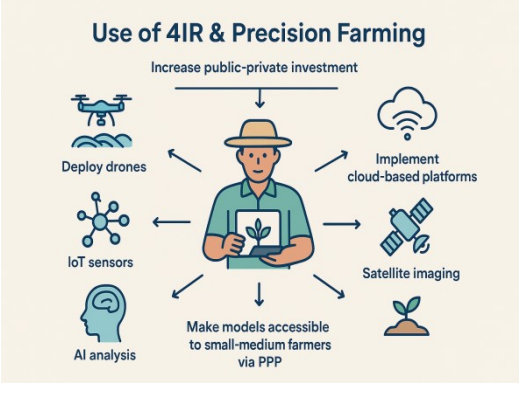

উপায়: সরকারি ও বেসরকারি খাতে বিনিইয়োগ বৃদ্ধি করে 4IR ভিত্তিক কৃষি প্রযুক্তি সহজলভ্য করা, ড্রোন, IoT সেন্সর, স্যাটেলাইট ইমেজিং ও AI-ভিত্তিক বিশ্লেষণ ব্যবহার করে ফসলের মান, সেচ ও সার ব্যবস্থাপনা উন্নত করা। কৃষকদের জন্য প্রশিক্ষণ ও ক্ষমতায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে 4IR প্রযুক্তি গ্রহণে সক্ষম করা, বড় ডেটা ও ক্লাউড ভিত্তিক তথ্য ব্যবস্থাপনা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে মাঠ পর্যায়ে সঠিক তথ্য ও পরামর্শ সরবরাহ নিশ্চিত করা। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রিসিশন ফারমিং মডেলগুলো ক্ষুদ্র ও মধ্যম আকারের কৃষকদের জন্য সহজলভ্য করা।

লক্ষ্যমাত্রা: ২০৩৫ সালের মধ্যে দেশের কৃষিক্ষেত্রে প্রিসিশন ফারমিং প্রযুক্তি সর্বাধিক সম্প্রসারণ নিশ্চিত করা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, ফসলের ক্ষতি কমানো এবং কৃষি উৎপাদনের দক্ষতা ও টেকসইকরণ নিশ্চিত করা।

৫.১.১৩ সম্প্রসারণ গবেষণা ও প্রযুক্তি বিস্তার

চ্যালেঞ্জ: বাংলাদেশে কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ সেবার মধ্যে সমন্বয়হীনতা রয়েছে। গবেষণা ফলাফল মাঠ পর্যায়ে কৃষকের কাছে পৌঁছতে দেরি হয়, যা নতুন প্রযুক্তি গ্রহণের বাধা সৃষ্টি করে। এছাড়া, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের সংখ্যা সীমিত, প্রশিক্ষণ ও আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞানের ঘাটতি রয়েছে।

উপায়: গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমের সমন্বয় নিশ্চিত করতে দেশের সকল কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা কেন্দ্র এবং ডিএই এর সম্প্রসারণ ইউনিটের মধ্যে সমন্বয়

বৃদ্ধি করা হবে। ডিজিটাল সম্প্রসারণ পদ্ধতি (যেমন, কৃষক স্মার্ট অ্যাপ, ই-ভাউচার ও তথ্যভিত্তিক সার্ভিস) ব্যবহার করে প্রযুক্তি দ্রুত কৃষকের কাছে পৌঁছানো সম্ভব। মাঠ পর্যায়ে ডেমো প্লট, প্রশিক্ষণ সেশন, ভিডিও কনটেন্ট ও স্থানীয় সমন্বয়ক নিয়োগ করা হবে।

লক্ষ্যমাত্রা: ২০৩৫ সালের মধ্যে আধুনিক প্রযুক্তি ও সম্প্রসারণ সেবা ব্যবহার করে কৃষি উৎপাদনশীলতা ৩০–৪০% বৃদ্ধি করা, এবং কমপক্ষে ১০ মিলিয়ন কৃষককে আধুনিক কৃষি পদ্ধতি ও নতুন জাত সম্পর্কে তথ্য পৌঁছে দেওয়া।

৫.১.১৪ কমিউনিটি সিড ব্যাংক, ফিল্ড জিন ব্যাংক ও জার্মপ্লাজম সেন্টার

চ্যালেঞ্জ: স্থানীয় ও দেশীয় বীজ জাত দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে এবং জলবায়ু পরিবর্তন, বাজার নির্ভরতা ও হাইব্রিড বীজের বিস্তারের কারণে কৃষকরা বীজ বৈচিত্র্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে জলবায়ু সহনশীল, উচ্চ ফলনশীল ও পুষ্টিকর জাত সংরক্ষণে বড় ধরনের ঝুঁকি তৈরি হয়েছে।

উপায়: স্থানীয় পর্যায়ে কমিউনিটি সিড ব্যাংক স্থাপন করে কৃষকের হাতে মানসম্মত ও দেশীয় বীজ সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে। গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ফিল্ড জিন ব্যাংক ও জার্মপ্লাজম সেন্টার গড়ে তোলা হবে, যেখানে বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করা হবে। কৃষক স্মার্ট কার্ড ও অ্যাপের মাধ্যমে কৃষকদের বীজ বিনিময়, সংরক্ষণ ও চাহিদা সম্পর্কিত তথ্য সহজলভ্য করা হবে। একই সঙ্গে কৃষক প্রশিক্ষণ ও ডেমো প্লটের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও ব্যবহার কৌশল শেখানো হবে।

লক্ষ্যমাত্রা: ২০৩০ সালের মধ্যে প্রতিটি জেলায় অন্তত একটি কমিউনিটি সিড ব্যাংক স্থাপন, ২০০টির বেশি স্থানীয়/দেশীয় জাত সংরক্ষণ, এবং কৃষকের মধ্যে ৫০% বীজ স্বনির্ভরতা অর্জন। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল ও পুষ্টিকর জাতের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।

প্রয়োজনীয় উদ্যোগ: কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, কৃষক সংগঠন ও স্থানীয় প্রশাসনের সমন্বয়ে সিড ব্যাংক পরিচালনা; জার্মপ্লাজম সংরক্ষণে আধুনিক প্রযুক্তি (ক্রায়ো-প্রিজারভেশন, টিস্যু কালচার); আন্তর্জাতিক জিন ব্যাংকের সাথে অংশীদারিত্ব; এবং বীজ সংরক্ষণে সরকারি ও বেসরকারি তহবিল বরাদ্দ।

৫.১.১৫ কৃষির রূপান্তর ও কৃষক সুরক্ষা

চ্যালেঞ্জ: জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অনিয়ন্ত্রিত বাজার ব্যবস্থা ও উচ্চ উৎপাদন খরচের কারণে কৃষকরা আর্থিক ঝুঁকিতে রয়েছে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণে সীমাবদ্ধতা উৎপাদনশীলতা কমাচ্ছে।

উপায়: ডিজিটাল কৃষি, প্রিসিশন ফার্মিং, কাস্টম হায়ারিং সেন্টার ও কৃষক স্মার্ট কার্ডের মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাস। কৃষকের জন্য শস্য বীমা, ঋণ, ইনপুট ভর্তুকি, আবহাওয়া তথ্য ও বাজারজাতকরণের তথ্য সরবরাহ। কৃষক প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও স্মার্ট অ্যাপের মাধ্যমে কৃষকের দক্ষতা বৃদ্ধি।

লক্ষ্যমাত্রা: ২০৩৫ সালের মধ্যে কৃষকের আয় ৩০–৪০% বৃদ্ধি, ঝুঁকি হ্রাস, খাদ্য নিরাপত্তা শক্তিশালীকরণ এবং টেকসই কৃষি রূপান্তর বাস্তবায়ন।

তথ্যসূত্রঃ

Topic	Source
Agricultural land (2022)	BBS 2022
Rice production (2022–23)	BBS/FAO 2022–23
Maize production (2021–22)	BBS 2021–22
Mustard production (2021–22)	BBS 2021–22
Women in ag labor force	BBS LFS 2022
Ag GDP share (2022–23)	BBS 2023
Child stunting (2022)	BDHS 2022
Maternal anemia (2022)	BDHS 2022
Mechanization (2022)	DAE/BBS 2022
Farmers trained in machinery	DAE 2022
Agro-industry jobs (2020)	BBS LFS 2022
Wheat area trend	BBS 2022
Maize area (2021–22)	BBS 2021–22
Mustard growth (2015–23)	BBS
Veg. prod. growth (2020–23)	BBS
Fruit prod. growth (2019–23)	BBS
Sesame growth	BBS
Soybean growth	BBS
Groundnut prods. (2021–22)	BBS 2021–22
High-value crop farmers	DAE
Tractors (2022)	DAE 2022
Harvesters (2022)	DAE 2022
Mushroom/flower export (2023)	EPB 2022–23
Farmers with loans	Bangladesh Bank
Dragon fruit area (2022)	BBS 2022
Strawberry area (2022)	DAE 2022
Cover Photo Credit	FAO, BD